■ আর্য সমাজ ঃ

উনিশ শতকের সূচনা পর্বে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের উদ্যোগে ভারতে ধর্ম ও সমাজসংস্কার এবং যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেমন আন্দোলন চলেছিল, তেমনি এই শতকের মধ্যভাগ থেকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। এমনই পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-'৮৩ খ্রিঃ)। গুজরাটের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। স্বভাবতই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। একুশ বছর বয়সে দয়ানন্দ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন। মথুরায় স্বামী বিরজানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি বৈদিক হিন্দুধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সারা ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি পণ্ডিতদের সাথে তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে বেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কাশীতে আয়োজিত এক তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তাঁর নাম ও দর্শন দ্রুত প্রসারিত হয়। কলিকাতায় এসে ব্রাহ্ম মতবাদের সাথেও তিনি পরিচিত হন। তবে বেদের অভ্রান্ততা সম্পর্কে সমকালীন ব্রাহ্মদের সংশয় তাঁকে ব্যথিত করে। কেশবচন্দ্রের পরামর্শে তিনি সংস্কৃতের পরিবর্তে হিন্দি ভাষায় তাঁর মতামত প্রচারে ব্রতী হন। 'সত্যার্থ প্রকাশ' ও 'বেদ ভাষা' নামক হিন্দি গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি নিজ বক্তব্য প্রচার করেন। ইংরেজি ভাষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না এবং এখানেই রামমোহন বা রানাডের সাথে দয়ানন্দর মৌলিক প্রভেদ। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না-করলেও, দয়ানন্দর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যথেষ্ট প্রগতিশীল। দয়ানন্দ মনে করেন বেদ অভ্রান্ত এবং একমাত্র প্রামান্য গ্রন্থ। তাঁর মতে জগৎ সংসারের সকল সত্য বেদে নিহিত আছে, এমনকি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রাথমিক ধারণাও বেদে পাওয়া যায়। ওমপ্রকাশ লিখেছেন যে, বেদের সত্যতা ও বাস্তবতা থেকে দয়ানন্দ বেদভিত্তিক ধর্মকে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম থেকেও শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করতেন। বেদকে প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে সামনে রেখেই তিনি মূর্তি পূজা ও বহু ঈশ্বরবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি অসবর্ণ বিবাহের পরম সমর্থক ছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথারও বিরোধিতা করেন। তিনি অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরুষ ও নারীর বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স যথাক্রমে

২৫ ও ১৬ হওয়া উচিত বলে মতপ্রকাশ করেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে 'গো-রক্ষিণী সভা' গঠিত হয়। গো-হত্যার প্রতিবাদ করে তিনি 'গোকরুণানিধি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

দয়ানন্দ সৌরাষ্ট্রের রাজকোর্টে 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৫ খ্রিঃ)। পরে বোম্বাই'তে এর প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মূলগতভাবে ব্রাহ্মসমাজ বা প্রার্থনাসমাজের সাথে আর্য সমাজের মূল ভিত্তি ছিল ভারতের অতীত ঐতিহ্য। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটে আর্য সমাজ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর জীবতকালেই আর্য সমাজের সদস্য সংখ্যা কুড়ি হাজারের কাছাকাছি হয়েছিল। প্রতিটি আর্য সমাজী তাঁর উপার্জনের এক শতাংশ সমাজ সেবামূলক কাজে ব্যয়ের জন্য সমাজের তহবিলে জমা দিতে বাধ্য ছিলেন। দয়ানন্দের মৃত্যুর পর লালা হংসরাজ, পণ্ডিত গুরুদত্ত, লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ আর্য সমাজীদের নেতৃত্ব দেন।

দয়ানন্দের জীবনাবসানের সময় আর্য সমাজের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছিল। এই সময় থেকে আর্য সমাজের কাজে আক্রমণাত্মক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজের নীতি ও কর্মসূচীর প্রশ্নেও মতভেদ প্রকট হয়। সমাজের নরমপন্থী গোষ্ঠী সমাজসেবা ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে জোর দেন। বালক ও বালিকাদের জন্য দেশজুড়ে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৬-তে দয়ানন্দের শিষ্যরা লাহোরে 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-ভেদিক ট্রাস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বৈদিক শিক্ষা প্রচার করা এবং সামাজিক কুসংস্কারগুলি দূর করা। নরমপন্থী আর্য সমাজীরা বেদ শিক্ষার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ী ইংরাজি শিক্ষার উপরেও গুরুত্ব দেওয়ার উপর জোর দেন। অন্যদিকে সনাতনপন্থীরা শুধুমাত্র বৈদিক জ্ঞান, আর্য আদর্শ এবং সংস্কৃত ও মাতৃভাষার পঠন-পাঠনে জোর দেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন পণ্ডিত লেখরাম, লালা মুন্সিরাম প্রমুখ। এঁদের উদ্যোগে হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

আর্য সমাজীরা নারী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। ১৮৯৬-তে তাঁরা আর্যকন্যা পাঠশালা ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কুমারী কন্যাদের সাথে সাথে বিবাহিতা ও বিধবা মহিলাদেরও শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা অর্জনে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য 'পাখ্খালপণ্ডিতা' নামক পত্রিকা প্রকাশ করে প্রচার চালানো হয়।

পণ্ডিত গুরু দত্ত, পণ্ডিত লেখরামের নেতৃত্বে একদল আর্য সমাজী বৈদিক ধর্ম প্রচারের উগ্র কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণে হিন্দুদের আগ্রহ হিন্দু সমাজপতিদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করেছিল। খ্রিস্টান মিশনারিদের উন্নয়নমুখী কর্মসূচী ও উদারতা এবং ইসলাম ধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা স্বাভাবিক কারণে সামাজিকভাবে অবহেলিত হিন্দুদের আকর্ষণ করে। এই পরিস্থিতিতে আর্য সমাজ শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার দ্বারা ধর্মান্তরিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান ঘটনা আর্য সমাজীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পরিস্থিতিতে আর্য সমাজ 'শুদ্ধি' আন্দোলন শুরু করে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার দ্বারা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। শুদ্ধি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অস্পৃশ্যদেরও উচ্চতর বর্ণে স্থান দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়। ক্রমে নরমপন্থীরা সমাজের পরিচালনার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন। চরমপন্থীরা গোরক্ষা আন্দোলনের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন। ফলে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কেনেথ জোনস্ (Keneth W. Jones) তাঁর Arya Dharm ; Hindu Consciousness in 19th century 1976 শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কাজকর্মের জন্যই আর্য সমাজের মধ্যে আক্রমণাত্মক ভঅবধারা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ড. অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, দয়ানন্দর ধর্মমতের মধ্যে পাঞ্জাবের জাট ও শিখরা বিদেশি প্রভাবমুক্ত একটি বলিষ্ঠ আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল। তাঁর ভাষায় : 'পাঞ্জাবের অপমানিত পৌরুষের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ ছিল আর্য সমাজ আন্দোলন।' আফগান, মুঘল ও ব্রিটিশের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে শিখদের সংগ্রামের প্রেরণা এসেছিল আর্য সমাজ আন্দোলন থেকে। এই কারণে ভ্যালেন্টাইন চিরল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য আর্য সমাজীদের দায়ী করেছেন। তবে অরবিন্দ ঘোষ স্বামী দয়ানন্দের ব্যক্তিগত চরিত্র, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রতি প্রশ্নহীন শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন : 'ব্রোঞ্জের উপর খোদাই কাজের মতো সমকালীন মানুষের মন ও সমাজের উপর তাঁর গভীর প্রভাব অঙ্কিত হয়েছিল। ঈশ্বরের

কর্মশালায় নিযুক্ত অক্লান্ত, অমিতশক্তির এই মানুষটির কথা মনে পড়লে আমার দৃষ্টিপটে অসংখ্য সংগ্রাম, কর্মসাফল্য ও শ্রমার্জিত জয়ের ছবি ফুটে ওঠে।' আর্য সমাজের কর্মসূচি ও আদর্শ ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটায়। এই কারণে **ড. অমলেশ ত্রিপাঠী** দয়ানন্দকে 'ভারতের বিপ্লববাদের অন্যতম প্রচারক' বলে বর্ণনা করেছেন।

আর্য সমাজের দুটি দিক ছিল,—একটি প্রগতিশীল এবং অন্যটি প্রতিক্রিয়াশীল। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করে এরা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ সঞ্চারেও আর্য সমাজের ভূমিকা স্মরণীয়। কিন্তু বেদকে অভ্রান্ত এবং সকল সত্যের আধার হিসেবে গ্রহণ করে এঁরা নিজেদের সংকুচিত করে তোলেন। শুদ্ধি আন্দোলন এবং গো-রক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা আর্য সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন। **ড. ত্রিপাঠী** লিখেছেন : 'সাম্প্রদায়িকতার উত্তরে সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতার উত্তরে অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন তিনি (দয়ানন্দ)। গৌ-রক্ষিণী সভাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা দানা বেঁধেছে। প্রগতির তত্ত্বকে অস্বীকার করে, সত্য অনুসন্ধানের যুক্তিবাদী পথ পরিত্যাগ করে এবং সর্বোপরি আর্য ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অন্যান্য ধর্মতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে দয়ানন্দ অসহিষ্ণু ইহুদী সুলভ মনোভাব দেখিয়েছেন।' এর ফলে আর্য সমাজের সার্বিক-গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয় এবং সাম্প্রদায়িকতার উপাদান সঞ্চারিত হয়।